



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 317 - 325

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

অস্তিত্ববাদী ভাবনায় স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাসে ‘আমি’

ড. মিনাল আলি মিয়া

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়

Email ID : minal87011@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

existentialism,
existential crises,
free will,
ultimate choice,
consciousness,
identity.

Abstract

Originating with Kierkegaard and popularized by Sartre, existentialism explores profound emotions, consciousness, freedom, and choice, often portraying love, values, and emotions as devoid of inherent meaning. This philosophy typically leads individuals toward existential crises, reflecting its pessimistic undertones. However, post-independence Bengali novelists have uniquely adopted and adapted existentialist principles to illuminate the challenges of Bengali life on a global stage. They draw parallels between their characters and archetypes like Raskolnikov and Sisyphus, exploring the complexity of human existence. This integration infuses Bengali literature with resilience, transcending despair through the affirmation of free will and ultimate choice. This synthesis not only highlights the depth of human existence but also establishes a distinct Bengali literary identity, emphasizing humanity's pursuit of meaning and work as guiding principles in these novels.

Discussion

উত্তরাধুনিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনে প্রতিনিয়ত সাধারণ নাগরিক বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংশয় ও সংকটে জরা-জীর্ণ। দিশাহারা - ক্লান্ত - আত্মযন্ত্রণায় অস্থির। অন্যদিকে শাসক ও বিভ্রাটী শ্রেণি, নিজের লাভের কড়ি ধরে রাখতে ও চক্রবৃদ্ধি হারে সুখ-সম্পদ বাড়াতে অতি-তৎপর, ক্ষমতা ধরে রাখতে নানা ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত। ফলে অসহায় মানুষ হয়েছে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালকদের আঙা-বহ দাস। যত দিন যাচ্ছে লোভী, ক্ষমতাবান ও স্বার্থান্বেষী মানুষ-গোষ্ঠী হয়ে উঠছে আরও বেশি করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে উন্মুখ। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জয়-যাত্রায় অন্ধ ভক্তের মতো মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে — টেলিভিশন, ল্যাপটপ, মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও what's app-এ ক্ষয় হচ্ছে সৃজনশীল উদ্যমী অমূল্য কৈশোর-যৌবন। এই তীব্র প্রতিযোগিতার মানসিকতায় অভ্যস্ত গতিশীল সমাজ-বাস্তবে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় কোথায় আমাদের? তাই প্রত্যেক মানুষ যেন সময়ের কাছে নতজানু। নিজেকে টিকিয়ে রাখার পথ-সন্ধানই খরচ হয়ে যাচ্ছে আয়ুর কড়ি! তবে এই যাপন-পদ্ধতির বাইরেও কিছু মানুষ আছেন। সেই সমস্ত সুস্থ চিন্তাশীল আত্ম-পর বোধশূন্য যুক্তি-বুদ্ধি নির্ভর ও স্বাধীনসত্তার অধিকারী মানুষেরা প্রশ্ন তুলেছে— এই বিপন্ন মানুষের অস্তিত্বের শিকড় কোথায়? প্রশ্ন উঠে আসে, ‘আমি’কে? আমার ‘অস্তিত্ব’ কোথায়? আর তখনই আসে বুদ্ধি ও যুক্তির প্রসঙ্গ। সামাজিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ জন্মের পর মানুষ বিশেষ

পরিবেশ, সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কার থেকে লাভ করে আগামীতে বাঁচার ঘের ও ঘোর। যাপন-ধারণা। কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতি মানুষের স্বাধীন-মুক্ত চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবুও শত বাধা অতিক্রম করে সামাজিকের অন্তরে উদ্ভাসিত হয় মুক্ত অনুভূতি ও স্বাধীনসত্তা। মুক্ত অনুভূতি ও স্বাধীনসত্তা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তি-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করে। জীবন সংগ্রামের সংকট, দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, হতাশা, ব্যর্থতা ইত্যাদি অবস্থাগুলি ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধির সহায়ক। সার্বিক মানুষের ভাবনা থেকে সরে এসে কখনো কখনো ব্যক্তি, তার অভিজ্ঞতা ও চেতনার মাধ্যমে বিশ্বের বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও স্বাধীন ভাবে নিজেকে উপলব্ধি করে, অভীষ্ট লক্ষ্য নির্বাচন এবং সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যক্তি-সত্তার এই অভিপ্রায়-ই হল ‘অস্তিত্ব’ (existence)। স্বাধীনসত্তা, অস্তিত্বের চূড়ান্ত পরিচালক। যেখানে স্বাধীনতা নেই, সেখানে ব্যক্তির ‘অস্তিত্ব’ বিপন্ন। অস্তিত্বকেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনা হল বাস্তবনির্ভর জীবনমুখী দর্শন। অস্তিত্বনির্ভর দর্শনকেন্দ্রিক আলোচনা ও মতাদর্শকে বলা হয় ‘অস্তিত্ববাদ’ (existentialism)। অস্তিত্ববাদ হল একটি জীবনবাদী দর্শন। আমাদের যাপিত জীবনে ক্লান্তি, হতাশা, বিষণ্ণতা ও ব্যর্থতা আছে— এটি যেমন সত্য তেমনই আমাদের আছে উপলব্ধিটি, আত্মমুক্তি এবং স্বাধীন চেতনা। সেই পরিচিত জগৎ ও জীবনকে নতুন ভাবে দেখা ও উপলব্ধি করাই অস্তিত্ববাদী দর্শনের দ্রষ্টব্য।

কিয়ের্কেগারদের হাত ধরে অস্তিত্ববাদী দর্শনের সূচনা হলেও জাঁ-পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০) দার্শনিক চিন্তা-ধারণার সূত্রেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের বিকাশ ও বিস্তার ঘনীভূত বৌদ্ধিক পরিসরে। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে ‘Being and Nothingness’ (১৯৪৩) মধ্যে দিয়ে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে সার্ত্রের আবির্ভাব। শুধু সার্ত্রে নয়, হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), কাল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), ফ্রানৎস কাফ্কা (১৮৮৩-১৯২৪), আলব্যের ক্যামু (১৯১৩-১৯৬০) প্রমুখ দার্শনিক ও সাহিত্যিকরা ছিলেন বিশ শতকের উজ্জ্বল চিন্তাবিদ। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা দুই দলে বিভক্ত। যথা— আন্তিক ও নাস্তিক অস্তিত্ববাদী। কিয়ের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫), কাল ইয়েসপার্স (১৮৮৩-১৯৭২), গ্যাব্রিয়েল মারসেল (১৮৮৯-১৯৭৫) প্রমুখ ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং আন্তিক অস্তিত্ববাদী। অপরদিকে ঈশ্বর বিশ্বাসী নন— ফ্রেডারিক নীটশে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন হাইডেগার (১৮৮৯-১৯৭৬), জাঁ-পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), আলব্যের ক্যামু, দস্তয়েভস্কি, কাফ্কা প্রমুখ। যথার্থ খ্রিষ্টান হওয়াই ছিল সোরেন কিয়ের্কেগার্দ অস্তিত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তিনি জীবনের তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন— ক) ভোগীয় স্তর (aesthetic stage), খ) নৈতিক স্তর (ethical stage), গ) ধর্মীয় স্তর (religious stage)। তিনি মানুষ ও ঈশ্বরকে একই আসনে বসিয়েছেন। তাঁর মতে জ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে খ্রিস্টধর্ম, ঈশ্বর ও শাস্ত্র সত্যকে জানা যায় না। নিজেকে জানাই হল খ্রিস্টধর্ম ও ঈশ্বরকে জানা, খ্রিস্টধর্ম ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। এটাই ছিল তাঁর কাছে যথার্থ অস্তিত্ব। কিন্তু নীটশে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরোধিতা করে বলেন— ঈশ্বর মৃত (God is dead)। আমরা ঈশ্বরকে হত্যা করেছি, ঈশ্বর মরে গেছে। (God is dead! God remains dead. And we have killed him!) তাঁর মতে দেহ ও মন, কর্ম ও জ্ঞান সবই এক এবং ইচ্ছাশক্তি (will to power)-এর অংশ। আর ব্যক্তির সমস্ত নির্বাচন ও ক্রিয়াকর্ম হল ক্ষমতালভের ইচ্ছা (will to power)। অর্থাৎ নীটশে মানুষের সমস্ত নির্বাচনের নির্ণায়ক হিসেবে ইচ্ছাশক্তি ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। খ্রিস্টধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকারের করে নীটশে মানুষকে শ্রেষ্ঠমানব বা অতিমানব (superman)-এর পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছেন। ঈশ্বর মৃত, সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবে মানুষ। সেই মানুষ, সাধারণ নয়, সে হল শ্রেষ্ঠমানব।

বিশ শতকে অস্তিত্ববাদী আন্দোলনের অন্যতম দার্শনিক-ব্যক্তিত্ব হলেন মার্টিন হাইডেগার। তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন দার্শনিক জাঁ-পল সার্ত্রে। হাইডেগারের ‘Being and Time’ (১৯২৭) গ্রন্থের অনুসরণে সার্ত্রে, তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন ‘Being and Nothingness’ (১৯৮৩)। হাইডেগার ‘Being’ প্রসঙ্গে নতুন ভাবনার উদ্ভাবক। ‘Being’-কে জানতে হাইডেগার ‘কিছু জানা’ (know-that) থেকে ‘কীভাবে জানা’ (know-how), ‘আছে’ থেকে ‘কীভাবে আছে’ এই অনুসন্ধান করেন। জগতে অসংখ্য বস্তু আছে এবং সেগুলি অস্তিত্বশীল কেন? এই সব জিনিসের অস্তিত্ব না থাকলে কী হত? শূন্যতার পরিবর্তে এসব জিনিস আছে কেন? কিসের জন্য? ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার। তাঁর সব প্রশ্ন হল ‘Being’-কেন্দ্রিক। ‘Being’ হল তাঁর কাছে সার্বিক অস্তিত্ব। দার্শনিক হাইডেগার অস্তিত্বের প্রতিশব্দ হিসেবে ‘ডাজাইন’ (Dasein) শব্দটি ব্যবহার করেন। অস্তিত্বই মানুষের সারসত্তা। সারসত্তা ও অস্তিত্বের প্রধান ভিত্তি হল স্বাধীন

সত্তা। অস্তিত্বশীল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে। স্বাধীনতার ভিত্তিতে হাইডেগার অস্তিত্বকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ক) যথার্থ অস্তিত্ব (authentic existence), খ) অযথার্থ অস্তিত্ব (in-authentic existence)। ‘Das mann’ যখন জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে গডালিকা প্রবাহে অবস্থান করে, জনতার থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারে না— এই ধরনের ব্যক্তির অস্তিত্ব হল অযথার্থ অস্তিত্ব (in-authentic existence)। স্বাধীন নির্বাচন করার ক্ষমতা রাখে— এই ধরনের সচেতন ব্যক্তি অস্তিত্ব হল যথার্থ অস্তিত্ব (authentic existence)। অস্তিত্বশীল ব্যক্তি অস্তিত্বের জগতে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ। তার আত্মোপলব্ধি থেকে মনস্তাপ জাগে। মনস্তাপ থেকে ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও নৈরাশ্য। ব্যতিক্রমী দৃঢ়চিত্তের মানুষ, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেও অস্তিত্বশীল, নিজের অস্তিত্বের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা।

হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্তির সন্ধানে হাইডেগার Nothing ও Time-এর প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। ‘Nothing’ হল অনস্তিত্ব, আর Time হল কাল। অস্তিত্বের বিপরীত হল অনস্তিত্ব। অস্তিত্বমৃত্যুর মধ্য দিয়ে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ মৃত্যুতে অস্তিত্বের সমাপ্তি। অস্তিত্ব সচেতন ব্যক্তি ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হয়। ভবিষ্যতের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। মৃত্যু প্রসঙ্গে হাইডেগারের অভিমত—

“Death is thus defined as the innermost and irrelative potentiality of Being, certain and indefinite as to its ‘when’ and not to be overcome.”²

মৃত্যু ভাবনা থেকে মানুষের মধ্যে দেখা দেয় উদ্বেগ। কারণ মৃত্যু অস্তিত্বশীল মানুষকে স্মরণ করে দেয় অস্তিত্বের ব্যাপ্তির ‘ক্ষণস্থায়ীত্ব’। ‘ক্ষণস্থায়ী’ জনিত মানসিক উদ্বেগ থেকে মানুষ কালের মধ্যে বিচরণ করে। যথা— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনটি ক্রমে। অতীত হল ‘যা নেই’, ভবিষ্যৎ হল ‘যা এখনো ঘটেনি’, আর বর্তমান হল ‘এখন’। কালের এই তিন স্তরের মধ্যে অস্তিত্বের চিন্তার বিষয় হল ভবিষ্যৎ কাল। কারণ, সময় হল সাধারণ মুহূর্তের সমষ্টি, কিন্তু ভবিষ্যৎ শুধু কতগুলো মুহূর্তের সমষ্টি নয়, বরং বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির, নীতি-আদর্শ-ধারণার ভালো-মন্দের চিহ্নায়ক, নির্ধারক। অস্তিত্বশীল ব্যক্তি ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হয় আত্মজ্ঞানকে সম্বল করে। এই আত্মজ্ঞানই হল বিবেক। বিবেক দায়িত্ব সম্পন্ন করে, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলে। বস্তুত মানুষ কালে নয়, মানুষের মধ্যে কাল অবস্থান করে। তাই কাল হল অস্তিত্বের প্রকাশক। কাল মানুষের সৃষ্টি, মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

হেগেল, হুসারল, হাইডেগারের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক প্রত্যয় থেকে সরে এসে সার্ত্রে, মানুষ-সমাজ-জগতকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। দার্শনিক রেনে দেকার্তের ‘cogito ergo sum’ অর্থাৎ ‘I think, therefore I am’ (আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি)। সার্ত্রের ধারণা ঠিক তাঁর বিপরীত ‘I am, therefore I think’ অর্থাৎ আমি আছি, তাই আমি চিন্তা করি। সার্ত্রের ‘আমি আছি’—এই চেতনাই হল ‘অস্তিত্ব’। অস্তিত্ববাদের জনক কিয়ের্কেগার্ডের ‘সারসত্তা অস্তিত্বের পূর্ববর্তী’ (essence precedes existence)-র বিপরীতে বলেছেন ‘অস্তিত্ব সারসত্তার পূর্ববর্তী’ (existence precedes essence)। ‘Being and Nothingness’ গ্রন্থে তাঁর প্রধান আলোচনার বিষয় হল ‘মানুষ’ ও ‘বস্তু’। মানুষ হল চেতন, বস্তু বা জগৎ হল অচেতন। মানুষ অপূর্ণ, বস্তু পূর্ণ। জন্ম থেকে মানুষ অভাব গ্রস্ত ও অপূর্ণ। তাই অভাব থেকে মুক্তির জন্য মানুষ পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। ব্যক্তি অবস্থা, নির্বাচন ও নৈতিকতার পরিবর্তন করে। ফলত, মানুষ চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু বস্তু স্থির অপরিবর্তনশীল। উদাহরণ : একটি ‘কলম’ শুধুই ‘কলম’-এর বেশি বা কম কিছুই নয়। কলম নামক বস্তুটি পূর্ণ, স্থায়ী ও নির্দিষ্ট অচেতন বস্তু। কিন্তু মানুষের কোনো স্থায়ী স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য নেই। মানুষ স্বভাবতই বিবর্তনধর্মী ও পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি তার আত্মগত ভাবনায় নির্দিষ্ট কোনো স্বভাবকে ধরে রাখতে পারে না। সার্ত্রের মতে, সে যা, তা সে নয়; এবং সে যা নয়, সে ঠিক তাই। হাইডেগার জগতের মধ্যে মানুষের অস্তিত্বের সন্ধান করেছেন। কিন্তু সার্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষ ও জগৎ দু’টি স্বতন্ত্র সত্তা। তাই মানুষ পূর্ণতার দিকে ধাবিত হলেও তার চেতনাকে হারাতে চায় না। অর্থাৎ মানুষ হল চেতন-অচেতনের সম্মিলিত রূপ। চেতন ও অচেতনের মিলন বা সমন্বয়কে সার্ত্রে বলেছেন ‘ঈশ্বর’। কিন্তু চেতন-অচেতনের মিলন অসম্ভব। অতএব ঈশ্বরের ধারণাও মিথ্যা, অস্তিত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। এই ধারণা থেকেই প্রচলিত ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ ও প্রত্যাখানের অনুশীলন। কিন্তু সার্ত্রে যখন বলেন, প্রত্যেক মানুষের চরম ও চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা হল ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি, তখন প্রশ্ন জাগে, ঈশ্বরের যদি অস্তিত্বই না থাকে, তাহলে মানুষের ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাও অবাস্তব।

আসলে নীটশে ঈশ্বরকে মৃত ঘোষণা করে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সার্বত্রিক মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মহিমা ও বিশালতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি নাস্তিক নন, আস্তিক। মানুষ ঈশ্বর হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন থাকে কিন্তু সে স্বপ্ন অপূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু সার্বত্রিক মত অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের ঈশ্বর হবার আকাঙ্ক্ষাকে যদি চরম ও চূড়ান্ত বলে মনে করা হয়, তাহলে ব্যক্তি স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটে। প্রসঙ্গত সার্বত্রিক বলেছেন, চেতন ও অচেতনের সমন্বয়ের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই— এটা শুধু মানুষের একটা আকাঙ্ক্ষা, চরম লক্ষ্য মাত্র এবং মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। অসংখ্য জিনিসের মধ্যে মানুষ যে কোনো একটা নির্বাচন করতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা মানুষের আছে।

‘জগৎ-মধ্যস্থ-সত্তা’ মানুষ। চেতনেরগতি ও সক্রিয়তা তার আছে। সার্বত্রিক সত্তাকে দু’ভাগে ভাগ করেছেন। যথা : ক) অচেতন বা পূর্ণ সত্তা (Being-in-itself), খ) চেতন বা অপূর্ণ সত্তা (Being-for-itself)। যে সত্তা পূর্ণ, যার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই ও পরিবর্তন নেই, সেই সত্তা হল অচেতন বা পূর্ণ সত্তা (Being-in-itself)। যেমন : কাঠ, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। অন্যদিকে চেতন হল অপূর্ণ, পরিবর্তনশীল, অস্থির, অনির্দিষ্ট ও অনিত্য। চেতন অবিশ্বাসও নয়, কল্পনাও নয়, এটি যা ঠিক তা নয়, বরং এটি যা নয়, ঠিক তাই। চেতনসত্তার অধিকারী মানুষ ভবিষ্যৎ-গামী, কর্ম সম্পাদন ও নির্বাচনকারী স্বাধীন। মানুষের অস্তিত্ব, চেতন-সত্তা ও অপূর্ণ-সত্তা এক, অভিন্ন। সার্বত্রিক, অপূর্ণ সত্তাকে প্রশ্ন উত্থাপনে (interrogation), ধ্বংস চিন্তায় (destruction), নেতিবাচক বাচনে (negative judgment) বিশ্লেষণ করেছেন। সার্বত্রিক দেখিয়েছেন, বস্তু-জগৎ পূর্ণ কিন্তু মানবসত্তা অপূর্ণ ও শূন্যতায় নিমজ্জিত। শূন্যতা ও স্বাধীনতাকে এক ও অভিন্ন বলে তিনি মনে করেন।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের অন্যতম বিষয় হল স্বাধীনতা। সার্বত্রিক চরম ও সসীম স্বাধীনতার কথা বলেছেন। স্বাধীন ব্যক্তি, নির্বাচন ক্ষমতার অধিকারী। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীন বিশ্বে মানুষই নিয়ম বা আইনের স্রষ্টা। সুতরাং মানুষের নিয়ম বা আইন মানার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ মানুষ স্বভাবগত ভাবে স্বাধীন। স্বাধীনতা অনন্ত ও চিরন্তন নয়। স্বাধীনতাও ক্ষণস্থায়ী ও সীমাবদ্ধ। ‘মৃত্যু’ মানুষের জীবনের শেষ সীমারেখা— যা অনিয়ন্ত্রিত ও নিশ্চিত। মৃত্যু একটি অনিবার্য পরিণতি—যা নির্বাচন করা যায় না, আগে থেকে জানা যায় না এবং অপেক্ষাও করা যায় না। কিন্তু চূড়ান্ত স্বাধীনসত্তার স্বীকৃতি সূত্রে মানুষ ইচ্ছে করলে আত্মহত্যার মাধ্যমে মৃত্যু বরণ করতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মৃত্যু স্বীকৃত নয়। সার্বত্রিক মতে মৃত্যু মানুষের নির্বাচন নয়, মৃত্যুর ওপর মানুষের কোনো কর্তৃত্ব নেই— তাই মৃত্যু অনিয়ন্ত্রিত ও অবধারিত। সার্বিক সত্তা নয়, ব্যক্তি-সত্তাকে চিহ্নিত করেছেন সার্বত্রিক। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন—জীবিত থাকা, কর্ম সম্পাদন করা এবং মৃত্যুবরণ করা প্রভৃতি ঘটনা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমান। সার্বত্রিক ‘শর্ত’ ও ‘অবস্থান’ শব্দের দ্বারা বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। সর্বকালে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঘটনাকে ‘শর্ত’ এবং আকস্মিক ঘটনাকে ‘অবস্থান’ বলে ব্যাখ্যা করেছেন সার্বত্রিক। শর্ত হল মনস্তাপ (anguish)। মনস্তাপ মানুষকে স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথ হিসেবে সার্বত্রিক কৃত্রিম বিশ্বাস (bad faith)-এর কথা বলেছেন।

অস্তিত্বকে সম্ভাবনাময় দৃষ্টিতে দেখেছেন ইয়েসপার্স। তাঁর মতে অস্তিত্ব একটি স্বাধীন ক্রিয়া—যা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। তাঁর মতে, -

“যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারি যে, আমি আমার নিজের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী, তখন আমি জানি যে আমি অসম্পূর্ণ। আমি স্বাধীন অথচ আমি স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। জগতের সঙ্গে আমার যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে তা আমি কখনো ভুলতে বা অস্বীকার করতে পারি না। জগতের মধ্যে অবস্থান ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই, ঠিক তেমনি অতিবর্তিতা ছাড়া আমি ঠিক আমি নই।”^২

ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে স্বাধীন নির্বাচন ও কর্ম-সম্পাদনে। নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি যথার্থ ধার্মিক, অতিমানব ও ঈশ্বরের আসনে নিজেকে বসায়। ঈশ্বর পূর্ণ আর মানুষ অপূর্ণ। অভাব ও অপূর্ণতা থেকে মুক্তির জন্য ব্যক্তি পূর্ণ তথা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনে প্রয়াসী। কিন্তু চেতন ও অচেতনের মিলন ঘটে না। ফলে অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনা থেকে অস্তিত্বশীল ব্যক্তির মধ্যে দেখা দেয় শঙ্কা (dread), উদ্বেগ (anxiety), মনস্তাপ (anguish) ও একাকীত্ব সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে এক সুস্থ-সুন্দর সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের চূড়ান্ত অভিপ্রায়। তাই অস্তিত্ববাদ,

ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুখ-দুঃখসহ বিচিত্র জীবনানুভূতির আধার হলেও মানবতাবাদী, প্রবহমান জীবন-সম্পৃক্ত ধারণা। আর এই শ্রেণির দার্শনিকরা, কালেকালে অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের দোলাচলতায় মধ্যেও আশাবাদী, নাস্তিক হয়েও আস্তিক, শূন্যতার মধ্যে পূর্ণতার স্বরূপ সন্ধানী।

বিশ শতকে দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় অস্তিত্ববাদী দর্শনের লক্ষণ সন্ধান, একটি অন্যতম প্রবণতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অস্তিত্ববাদী সাহিত্যতত্ত্বের প্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকে দেখার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিকসহ নানা কারণে অস্থির, নিঃসঙ্গ ও হতাশ জীবনে মানুষ প্রতিনিয়ত খুঁজেছে বেঁচে থাকার অর্থ ও জীবনের তাৎপর্য। ব্যক্তির নিজস্ব ও স্বাধীন ভুবন, যেখানে মানুষ একা অথচ মুক্তির দিগন্ত প্রত্যাক্ষী। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা যে সমস্ত উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪), ‘কাঁদো নদী কাঁদো’, সমরেশ বসুর ‘শ্রীমতী কাফে’ (১৯৫৩), ‘বিবর’ (১৯৬৫), স্বীকারোক্তি (১৯৬৭); বিমল করের ‘যদুবংশ’ (১৯৬৭), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একা এবং কয়েকজন’ (১৯৫৮), যুবক-যুবতী (১৯৬৮); শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘুণপোকা’ (১৯৬৭), ‘পারাবার’ (১৯৭১); দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘তৃতীয় ভুবন’ (১৯৫৯-৬০); মতি নন্দীর ‘দ্বাদশ ব্যক্তি’ (১৯৬৯), ‘নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান’ (১৯৬৯), ‘নক্ষত্রের রাত’ (১৯৫৭); দেবেশ রায়ের ‘যযাতি’ (১৯৬৮), ‘মানুষ খুন করে কেন’ (১৯৭৬); শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘বৃহন্নলা’ (১৯৬১), ‘অনিলের পুতুল’ (১৯৬৩), ‘নিরবাক্ষর’ (১৯৭২); নবাবুণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’ (১৯৯৩) ইত্যাদি। উপন্যাসগুলিতে অস্তিত্ববাদী দর্শনের নানাদিক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী সাহিত্যতত্ত্ব থেকে বাংলা উপন্যাসে কীভাবে নিজস্ব অস্তিত্ব, দেশ-দশ ও জীবন দর্শনের অনুসন্ধান করেছে? আলোচ্য প্রবন্ধটি ভারতীয় তথা বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব অস্তিত্বের স্বরূপ সন্ধান—

ক) প্রতিস্পর্ধী চেতনা : প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা-অনুভূতি আছে, যা দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করি— সেটি হল চেতনা। পাশ্চাত্য দার্শনিক দেকার্ত চেতনা বলতে যে কোনো মানসিক অভিজ্ঞতাকে নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ইঙ্গিত করেছেন। সার্ত্রে’র মতে চেতনার বৈশিষ্ট্য হল, কোনো কিছু জানা, এই প্রবণতা থেকে চেতনা সবসময় কোনো না কোনো বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। সময়-কাল অবস্থা ভেদে একই ব্যক্তির চেতনার পরিবর্তন, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। সার্ত্রে বলেছেন—

‘মার্কসের মতে, মানুষ বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ নিজের ভাগ্য তার নিজের হাতে নেই, নিজের জীবন, নিজের কাজও; তার ধারণা সরাসরি সে নিজে তৈরি করেনি।’^৩

অর্থাৎ মানুষের চেতনা সময়-কালের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন— চব্বিশ-পঁচিশ এবং চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একই ব্যক্তি একই বিষয় নিয়ে সময়, সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন ধারণা ব্যক্ত করে। সার্ত্রে আত্ম অতি-ক্রমের চেতনার উপর মানব অস্তিত্বের নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন। অস্তিত্বের দুটি শ্রেণি। যথা- ক) অযথার্থ অস্তিত্ব (In Authentic Existence) খ) যথার্থ অস্তিত্ব (Authentic Existence)। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে যথার্থ অস্তিত্বের চেয়ে হাইডেগারের ভাষায় ‘das mann’ তথা অযথার্থ অস্তিত্ব (Inauthentic Existence) প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও পরিবার দ্বারা পীড়িত হওয়ার পর, কিংবা চিন্তন-মননের প্রতিবন্ধকতা থেকে ব্যক্তি যথার্থ অস্তিত্বের জগতে উপনীত হয়েছে। ‘শ্রীমতী কাফে’ উপন্যাসের ভজন দাদা নারায়ণ ও তার পথকে অনুসরণ করে সুখে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু বৈষম্য, শোষণ ও স্বার্থপরতা ঘরে-বাইরে সর্বত্র তার আনুগত্য ও পরনির্ভরশীলতা চেতনায় আঘাত করে। সে তার আনুগত্যের জগৎ থেকে নিজস্ব জগৎ খোঁজে। প্রশ্ন তোলে— ‘এ সমাজের বুকে তাই সে ব্যতিক্রমী নয়, একটা বিভ্রাট। যত অশ্রদ্ধা, তত তার দম্ভ। বিনয় হল ধাপ্টামো। ঘরে-বাইরের দুর্বুদ্ধিতা তাকে যেন নিয়ত পোড়াচ্ছে।...’^৪ ‘স্বীকারোক্তি’ উপন্যাসের নায়ক স্বাধীন দেশ-দেশের প্রতি বিশ্বাস রেখে পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল কিন্তু সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে বুঝতে পারে এ সমাজ জরাগ্রস্ত, দুর্নীতির আখড়া। তার চেতনা দ্বন্দ্বাক্রান্ত হয়। প্রশ্ন তোলে— ‘নৈতিক ধস নেমেছে, আর তার মাঝখানে সর্বার্থে ধাপ্পাবাজ এক সমাজে মেগালোম্যানিয়ায় আক্রান্ত তার প্রহত আহত চরিত্র পাত্র। ...সে কেরিয়ারবাদের দ্বারা তাড়িত, প্রতিযোগিতার দ্বারা পীড়িত। সে অবস্থার দাস, লোভের দাস—

যৌনতায় তার চারপাশে? ভয়াবহ শঠতা—।^৫ ‘প্রজাপতি’ উপন্যাসে সুখেন সমাজের চোখে মান্তান কিন্তু সমাজেই তাকে মান্তান বানিয়েছে। মতি নন্দীর ‘নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান’ উপন্যাসে হিরণ্য শ্যালিকা আভার যৌনতায় ডুবে থাকে, ক্রমে বিবেক-সামাজিকবোধ, নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সচেতনবোধে নিজ অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে যৌনতা নামক বাঁধাকে সরিয়ে ফেলতে চায়। খুন করে আত্মকে। ‘কারণ আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বদল চাইছিলাম এই নিত্যদিনের একঘোমি থেকে।...’^৬ বিমল করের ‘যদুবংশ’ উপন্যাসের নায়ক উপলব্ধি করেছে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলায় ভঙ্গুর অর্থনৈতিককে হাতিয়ার করে একদিকে শাসক শ্রেণি সাধারণ মানুষকে আর্থিক শোষণ-বঞ্চনা করে চলেছে। অপরদিকে শাসকের অনুগামী একদল মান্তান চাঁদা আদায়, মারধোর এবং নিয়ম-কানূনের তোয়াক্কা না করে সুবিধা নিচ্ছে। অধিকার, স্বাধীনতা শব্দগুলি ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যায়। পরিবারের মানুষগুলিও একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়। সচেতন জীবনবোধে নায়কের জিজ্ঞাসা অস্তিত্ব নিয়ে— ‘আমি প্রাণপণ ওদের আঁকড়ে ধরতে চাইছি। ওরা ক্রমশ ফস্কে যাচ্ছে। সবই যদি যায় তবে ত্রিশঙ্কু আমি, আমার বাঁচার সার্থকতা কী? আমার অস্তিত্বের অর্থই বা কী দাঁড়াবে?’^৭ অস্তিত্বের সংকট মানুষ কখন কখন হয়ে ওঠে খুনি। ‘মানুষ খুন করে কেন’ তা দেখানো হয়েছে। ‘যযাতি’ উপন্যাসে পারিবারিক বিচ্ছেদ থেকেই নায়কের বিবেক-চেতনার জাগরণ ঘটেছে। ‘তৃতীয় ভূবন’ উপন্যাসে জয়তী নিজের মেধা-শ্রম-অর্থ দিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে নাগরিক সভ্যতার ক্লান্ত গলি-বস্তিতে। সেখানে তার নিজেরই অস্তিত্ব বাঁচানো দায় হয়ে ওঠে। ‘আমার অনুভূতির তারগুলো কিছুতেই বাজে না কেন? সব কিছুতেই এমন তুচ্ছ আর মামুলি মনে হয় কেন? খুব একটা জ্যান্ত মানুষের মতো আমি টান হয়ে দাঁড়িয়ে চিংকার করে কোনো প্রত্যয়ের কথা বলতে পাড়ি না কেন? আমার কি হল? আমি কি মরে যাচ্ছি?’^৮ নবারণ ভট্টাচার্যের ‘হারবার্ট’-এর হারবার্ট; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘একা এবং কয়েকজন’-এর সূর্য, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘুণপোকা’-র শ্যাম প্রমুখ চরিত্রগুলিও দেশ-দেশের প্রতি আনুগত্য রেখেই সুস্থ-সুন্দর জীবনের প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু শাসক-শোষক, স্বার্থপরতা, যৌনতার দাস, লোভের দাস তাদের das mann চেতনার ওপর আঘাত হানে। তারা নিজের অস্তিত্ব খোঁজে, প্রতিবন্ধকতা ও অন্ধকারের পাথরটা সরিয়ে ফেলতে চায়— ক্রমে উদ্বিগ্ন-ভয়-শঙ্কা-ক্লান্তিতে সমাজ-জীবনের প্রতি হয়ে ওঠে প্রতিস্পর্ধী।

খ) ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার ও অতি-মানব কল্পনা : মানুষ স্বাধীন। তার নির্বাচন ক্ষমতাও স্বাধীন। জীবনে দুঃখ-কষ্ট, সাফল্য-পতন এবং জয়-পরাজয় সমস্ত কিছুই মানুষের ক্রিয়া-কর্ম, প্রত্যাশা ও অতৃপ্তি জড়িত। জীবনবোধ ও মানুষকে গুরুত্ব দিতেই নাস্তিক অস্তিত্ববাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। দার্শনিক নীটশে বলেছেন ‘ঈশ্বর মৃত’ (death of God)। গুরুত্ব দিয়েছেন ‘will to power’-কে। মানুষের ওপর মানুষের অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণ-বৈষম্য অবসানের জন্য ‘অতিমানব’-এর কথা বলেছেন তিনি। জাঁ-পল সার্ত্রে নীটশের অভিমতকে সমর্থন করে ঈশ্বরের আসনে মানুষকে বসিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

“Man being condemned to be free carries the weight of the whole world on his shoulders; he is responsible for the world and for himself as a way of being.”^৯

কিন্তু কান্ট তার নৈতিক দর্শনে মানুষের ভালো কাজ-কর্তব্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে মানবিকতা ও নৈতিকতার জোরালো আবেদন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক উপন্যাসে। ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাসে যৌনলিপ্সু ও খুনি কাদেরের প্রত্যক্ষ সাক্ষী আরেফ আলি কিন্তু সে পুলিশের কাছে কাদেরের খুনের কথা বলে না। তার মনে হয়—

“কাদেরের সঙ্গে তার যাত্রার কোনো যোগ নেই— তার বিশ্বাস হয়, সবারই চোখ আছে কিন্তু কেউ কিছু চোখে দেখে না। সবাই তাই অতল গহ্বরের প্রান্তে দাঁড়িয়েও নিরাপদ মনে করে।”^{১০}

অর্থাৎ আরেফ আলি একক ব্যক্তি নয়, সমাজ থেকে মানুষের দেহ ও মনের খুনি সত্তাকে স্বমূলে ছিন্ন করতে চেয়েছেন। ‘বিবর’ উপন্যাসের নায়ক অবক্ষয়িত সমাজ ও মানসের প্রতিনিধি। ঘৃষ, যৌনাচার ও খুনের মতো হীন ও দুর্নীতিমূলক কাজের জন্য গোটা সমাজের সঙ্গে নিজেকেও অপরাধের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে—

“আচ্ছা বলতে পারেন, আমি আপনি, আমরা কেন জেলের বাইরে?”^{১১}



পচন-সমাজ মানুষকে পরাধীন করে। তাই সে নীতাকে খুন করে মুক্তি পেতে চেয়েছে— যা মূলত will to power-কে পরিস্ফুট করে। ‘পারাপার’ উপন্যাসে পৃথিবীর দিশাহারা মানুষের সন্ধানে অতিমানবের কল্পনা করেছে—

“আজকাল আর তেমন মানুষের জন্ম হয় না। তেমন ল্যাংটো মানুষের— যে পৃথিবী কাঁপায়। যার দাবি-দাওয়া অভিশাপ নেই, যে দিতে আসে।”^{১২}

কিন্তু বিমান মানুষের ওপর বিশ্বাস হারায়নি। তার বিশ্বাস ভালোবাসা ও মানবতার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈরিতার অবসান হবে।

“এই পৃথিবী একদিন ক্রমমুক্তি হবে— ভালবাসা এবং সত্যের পথে।”^{১৩}

‘তৃতীয় ভুবন’ উপন্যাসে ভালবাসাকে প্রাধান্য দিতেই জয়তী প্রথমে ধর্মের সীমারেখাকে মুছে ফেলে মুসলিম ছেলে আসাদকে ভালোবেসেছে। কিন্তু তার দাদা যে মানুষগুলিকে ভালোবাসে দাঙ্গায় শান্তি মিছিল করেছিল তারাই তার দাদাকে হত্যা করেছে। দাদার জন্য জয়তী গর্ব অনুভব হলেও ঈশ্বরকে তার মনে হয়েছে মিথ্যা। কিন্তু সেই জয়তী মানুষ কেন বাঁচবে? তার সূত্র সন্ধানে কর্তব্যের কথাই বলেছে—

“মানুষ বাঁচে কেন? সে কেন বাঁচবে? তখন বুঝছে কেন জয়তী বাঁচবে। কর্তব্য পালন করার জন্য। যতক্ষণ-ভালো লাগবে ততক্ষণ, যখন ভালো লাগবে না— তখনও।”^{১৪}

এভাবেই দেখা যায়, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শনের সমর্থনে চূড়ান্ত ঈশ্বর বিরোধিতা নয়, নৈতিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তি-পরিবার, প্রতিষ্ঠান-সমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মানুষের কর্মের মধ্যদিয়ে মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে চেয়েছে। বিপর্যয়ের জন্য হতাশা উদ্ভিন্ন হয়ে বরন করে নিয়েছে একাকীত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে, বিদ্রোহ করেছে ব্যক্তি-সমাজের বিরুদ্ধে। এবং সৎ-সত্য চেতনার মাধ্যমেই সমষ্টির কল্যাণ প্রতিষ্ঠা প্রয়াস পরিস্ফুট হয়েছে।

গ) আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তির প্রয়াসে শূন্যতা : মানুষ জন্ম লগ্ন থেকেই অপূর্ণ। অপূর্ণ থাকার কারণেই সর্বদা বিরাজ করে শূন্যতায়। জাঁ-পাল সার্ভে তাঁর ‘Being and Nothingness’ গ্রন্থে চেতনাকে শূন্যতা বলেই অভিহিত করেছেন। এই সূত্রে বলা যায় চেতনা নির্দিষ্ট কোনো পরিধি নেই। সর্বদা সে আকাঙ্ক্ষাময়। আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মুক্তি অন্যতম। মূলত, অভাব-অপূর্ণতা-অতৃপ্তি থেকেই শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এক অর্থে স্ব-স্থিত সত্তাই (Being-in-itself) হল শূন্যতা। ‘চেতনার মধ্যে শূন্যতা আছে বলেই সে নিজেকে প্রশ্ন করতে সক্ষম। শূন্যতাই চেতনার সত্তা, কারণ শূন্যতা হল ব্যক্তির প্রশ্নের মাধ্যমে সৃষ্ট ফাঁকা যা চেতনার সত্তাকে গঠন করে। স্ব-স্থিত বা নঞর্থক বস্তু প্রকাশন করাই চেতনার কাজ, কিন্তু তা প্রকাশ করার জন্য স্বতন্ত্র জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। চেতনা স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে, কারণ চেতনার বোধ সরাসরি চেতনাতাই হয় অন্য জ্ঞানের সাহায্য নয়।^{১৫} এই চেতনা বা শূন্যতা দিয়েই ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তির স্বাদ আনন্দন করে চায়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারত তথা বাঙালিরাও সাম্য-মৈত্রী ও কল্যাণময় সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যে বাঙালির স্বাধীনতার রঙিন স্বপ্ন ফিকে হয়ে যায়। শাসক শ্রেণি সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের শাসক ও শাসিতের দূরত্ব তৈরী হয়। স্বনির্ভর ও স্বাধীন বাঁচার স্বপ্ন ভেঙে যায়। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থচারিত আচরণে ও ব্যক্তি-মানসের দ্বি-চারিতায় আত্ম সচেতন মানুষের শূন্যতার মধ্যে এক দিকে দেখা যায় হতাশা, উদ্বেগ (anguish), অপরদিকে দেখা যায় অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। বিপন্ন ও সঙ্কটাপন্ন শূন্যতা থেকেই নিজেদের অস্তিত্ব, বেঁচে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে— ‘সত্যি জীবনটার কোন মানে খুঁজে পাই না।’^{১৬} ‘এবার আমি কি করব? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুকের মধ্যে শুধু প্রতিধ্বনি শুনেছি, এতকাল ধরে কি অর্জন করলাম? আমি কি সুখী? সফল? এই জীবনই কি চেয়েছে?’^{১৭} ‘সুধার হাত থেকে মুক্তি চাই আমি। উঃ, সুধা! আমি ভাল হতে চাই। সৎ হতে চায় প্রমথ। মৃত্যুর সময় বিনা চেষ্টাতেই প্রমথ সৎ মানুষ হয়ে যাবে— এই বিশ্বাস আছে।’^{১৮} এহেন শূন্যতা থেকেই ব্যর্থ নায়ক-নায়িকারা একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা বেছে নেয় কেউ কেউ, আবার অনেকে আত্মহত্যা এবং মুক্তি প্রত্যাশা থেকেই খুনের আশ্রয় নেয়। বিকৃত চিন্তা ও কর্মপন্থায় তারা জীবনের সত্য খোঁজে— মুক্তি চায়— মুক্তিই তাদের অস্তিত্ব।

ঘ) নির্বাচনে স্বাধীন সমন্বয় চেতনা : মানুষ স্বাধীন, সুতরাং তার স্বাধীন নির্বাচনের সক্ষমতা আছে। স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার অস্তিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে স্বাধীন নির্বাচন একটি অন্যতম শর্ত। সার্ভে বলেছেন—

“মানুষ স্বাধীন, কারণ সে পূর্ণ নয় এবং স্ব-স্থিত সত্তা বা জড়বস্তুর মতো পর্যাপ্ত নয়। মানুষ যেহেতু অসম্পূর্ণ, মানুষের সম্ভাবনা আছে এবং তার নির্বাচনের (choice) ক্ষমতা আছে।”^{১৯}

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে স্বাধীন নির্বাচনের বিষয়টি সূক্ষ্ম ভাবেই গ্রহীত হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত স্বাধীন নির্বাচন থেকে সরে এসে সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছেন। স্বাধীনতায় ভয় পায় ‘বিবর’ উপন্যাসে নায়ক।

“আমি যে একটি কুলুপ আঁটা মাল বিশেষ, অর্থাৎ আমার সহস্র পরাধীনতা থেকে স্বাধীন হবার যোগ্যতা যে আমার নেই, নেই নয়, সব রকম স্বাধীনতাকেই আমি ভয় পাই,...”^{২০}

কিন্তু শূন্যতা মুক্তির প্রত্যাশায় স্বাধীন নির্বাচন করে। খুন করে নীতাকে। অনুশোচনা নয়, দ্বিধাহীন ভাবে অপরাধ স্বীকার করে—

“আমার গর্তের মধ্যে আমার সুখের পরাধীনতার মধ্যে অতি কুৎসিত নোংরা স্বাধীনতা নামক জিনিস আছে, যে হঠাৎ আমার কুণ্ডলীয়ে ভর করেছিল।”^{২১}

একই রকমভাবে ‘স্বীকারোক্তি’র উপন্যাসের নায়ক প্রতারণা ও মিথ্যা থেকে বাঁচতে স্বাধীন সত্তা দিয়ে ‘খুন’কে নির্বাচনের করে। খুন করে টোটদা (যার হাত ধরে ছাত্র রাজনীতি শুরু। তার নেতা, ফিলোজফার, গাইড), ল্যাম(অফিস বস), স্ত্রী দীপা, প্রেমিকা কুঁড়িকে। কিন্তু এই খুন তাকে মুক্তির পরিবর্তে যন্ত্রণা দেয়— নিয়ে যায় আরও এক গভীর শূন্যতায়। তার অনুশোচনা—

“খুনের মধ্যে সত্যি কোনও সুখ নেই বরং আপনি তাদের এক রকম দুঃখী বলতে পারেন, কারণ সে যা করছে, সেটাকে সে সমর্থন করে না, তার ভিতর করে না, তার ভিতর থেকে সে কিছুই পায় না, কেবল মনের একটা মরুভূমির মতো অবস্থা ছাড়া। হ্যাঁ, আমি শূন্যতার কথাই বলছি, সেটা ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক।”^{২২}

‘নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান’ উপন্যাসে সুকুমার স্ত্রী ভীষণ ভালোবাসে কিন্তু স্ত্রীর ডাল স্বভাবের জন্য প্রথমে তার একঘেঁয়ে লাগে; পরে সংসার হয়ে ওঠে ক্লান্তির আখড়া। এহেন পরিবেশ থেকে নিজের অস্তিত্বের খোঁজে খুন করে। তবে খুনকে লুকানোর প্রয়াস তার মধ্যে দেখা যায় না বরং সে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। অপরাধের শাস্তি স্বরূপ শুধু জেল নয়, ফাঁসির দাবি করে—

“...নিশ্চিত জেনো, আমি ফেয়ার হব না, আমি পুলিশের কাছে সারেন্ডার করব। ডিফেন্ড করব না কোটে। শুধু বলব, জেল-টেল নয় আমাকে ফাঁসি দেওয়া হোক। আই ওয়ান্ট টু ডাই।”^{২৩}

অর্থাৎ খুনের শাস্তি স্বরূপ লেখক মৃত্যু করাই যেন বলেছেন। ‘তৃতীয় ভুবন’ উপন্যাসে জয়তী জানে পৃথিবীতে মৃত্যু আছে— ধ্বংস আছে তবুও বেঁচে থাকতে হবে। তার দাদা যাদের ভালোবাসতো, যাদের জন্য শান্তির মিছিল করেছিল তারাই তাকে মেরেছে। মানুষ কত নিষ্ঠুর, পৃথিবী কী নির্মম। সে জিজ্ঞেস করেছে— কেন বাঁচব। একক ভাবে বাঁচার মধ্যে সে মুক্তি খুঁজে পায়নি। তাই পরিবারের প্রতি কর্তব্য সাধনের মধ্যেই বাঁচার সার্থকতা খোঁজে। জয়তীর বার্তা—

“মানুষ বাঁচে কেন? সে কেন বাঁচবে? তখন বুঝছে কেন জয়তী বাঁচবে। কর্তব্য পালন করার জন্য। যতক্ষণ-ভালো লাগবে ততক্ষণ, যখন ভালো লাগবে না— তখনও।”^{২৪}

এভাবেই অস্তিত্ববাদী ঔপন্যাসিকরা স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে আত্মহত্যা ও খুনের মতো কাজে লিপ্ত হলেও অপরাধ মুক্ত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবিকতার পথ দেখিয়েছেন। প্রশয় দেননি চূড়ান্ত স্বাধীন নির্বাচনকে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা তথা ভারতবর্ষে নানা ঘটনা ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সাক্ষী ভারতবাসীর মতো বাংলা লেখক-ঔপন্যাসিকেরা। আঞ্চলিক, জাতীয় পরিসরের ঘটনাবলী তারা যেমন প্রত্যক্ষ করেছে তেমনই আন্তর্জাতিক পরিসরের খবর রেখেছেন। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে ধারণ করেও ভারতীয় তথা নিজস্ব ‘আমি’কে প্রতিষ্ঠার ব্রত জারি রেখেছেন। হতাশা,



উদ্বোধন ও চূড়ান্ত স্বাধীন নির্বাচনের উদ্ভট আচরণ থাকলেও প্রতিটি পদক্ষেপে আছে ‘আমি’, মানবতা ও সত্য-সৌন্দর্যের চূড়ান্ত প্রকাশ। ‘আমি’ দর্শনের বীজমন্ত্র।

Reference:

১. Heidegger, ‘Existence and Being’, trans, by R.F.C Hull and Allen Crick, পৃ. ৭৪
২. চাকমা, নীরুসুমার, ‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা’, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৪৩
৩. ভদ্র, মৃণালকান্তি, ‘জ্ঞান-পল সার্ত্রের দর্শন অস্তিত্ববাদ ও মানবতাবাদ’, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৯১, পৃ. ২১০
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পা.), ‘সমরেশ বসুর রচনাবলী(১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৪
৫. তদেব, পৃ. ৪৫১
৬. নন্দী, মতি, পাঁচটি উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৯৩
৭. কর, বিমল, উপন্যাস সমগ্র(২), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৮৩
৮. রায়, দেবেশ (সম্পা.), দীপেন্দ্রনাথ রচনাসংগ্রহ(১), পরিচয়, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪২২
৯. Jean-Paul Sartre, ‘Being and Nothingness : An Essay on Phenomenological ontology’, Third Avenue, New York, Routledge, 2018, P. 670
১০. ওয়ালিউল্লাহ, সৈয়দ, ‘চাঁদের অমাবস্যা’, চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩২৯
১১. বসু, সমরেশ, ‘বিবর’, দ্বিতীয় সং. আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৯৮
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পা.), ‘সমরেশ বসুর রচনাবলী(১ম খণ্ড), দ্বিতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ২৯৪
১৩. মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু, উপন্যাস সমগ্র(দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৯৪
১৪. রায়, দেবেশ (সম্পা.), দীপেন্দ্রনাথ রচনাসংগ্রহ(১), পরিচয়, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৪৭
১৫. সরকার, স্বপ্না, ‘অস্তিত্ববাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান’, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৬২
১৬. বসু, সমরেশ, ‘বিবর’, দ্বিতীয় সং. আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৭৫
১৭. মতিনন্দী, ‘সাদাখাম’, তৃতীয় মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৮
১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, ‘বৃহন্নলা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৫৩
১৯. সরকার, স্বপ্না, ‘অস্তিত্ববাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান’, প্রগ্রেসিভ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৬২
২০. বসু, সমরেশ, ‘বিবর’, দ্বিতীয় সং. আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২০
২১. তদেব, পৃ. ১৬২
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ (সম্পা.), ‘সমরেশ বসুর রচনাবলী(৪র্থ খণ্ড), আনন্দ, ২০০৩, পৃ. ৪৯৯
২৩. নন্দী, মতি, পাঁচটি উপন্যাস, প্রথম প্রকাশ, সৃষ্টি প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০০১, পৃ. ১৮
২৪. রায়, দেবেশ (সম্পা.), দীপেন্দ্রনাথ রচনাসংগ্রহ(১), পরিচয়, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪২২